Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 479 - 488
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 479 - 488
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

লৌকিক ছড়ার অন্তরালে ইতিহাসের অনুসন্ধান

অসিত মন্ডল
Email ID : Ashitmondal85@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
লোকসাহিত্য, ছড়া, ইতিহাস।

Abstract
Rhymes are identified as a mirror of social history. Rhymes often portray the history of common people, which is absent from mainstream historical narratives. Hidden within the rhythm and words of these rhymes lie the history of Bengali wedding processions, the Mall kings of Bishnupur, the Dom Sena of the feudal kings of Rajnagar, the history of buying and selling girls for money in various regions of India, the story of Mughal emperor Jahangir sending his general Man Singh to defeat Pratapaditya, one of Bengal's twelve landlords, the Maratha invasions during the rule of Nawab Alivardi Khan, the Battle of Plassey, the arrival of the British, floods and droughts in Bengal, the Santal Rebellion, indigo cultivation, and ancient temples— each of which carries significant sociological and historical value.

Discussion

সৃষ্টির আদি থেকেই যখন মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে তখন থেকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তৈরি হয়ে আসছে নানান ছড়া। দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে এক যুগ থেকে অন্যযুগের সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া এইসব ছড়া গুলির রচয়িতার নাম হয়তো অজানা তবুও তাদের সৃষ্টি রয়ে গেছে আজও। বাংলার লৌকিক ছড়া সহজ সরল অভিব্যক্তি এবং দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যৌথ স্রোতে সৃষ্টি হয়েছে। সেই অর্থে ছড়াকে সমাজ ইতিহাসের দর্পণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

> "সাহিত্য মাত্রই কোনো না কোনো দিক থেকে কালের সাক্ষী সুতরাং লোকসাহিত্যেও যে বিভিন্ন কালের নানাবিধ তথ্য পাওয়া যাবে -একথা বলাই বাহুল্য। লোকসাহিত্যের একটি বড় অংশ আবার সম্পূর্ণতই ইতিহাস ভিত্তিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মুখর।"[১]

বাংলা লৌকিক ছড়াগুলিতে বাঙালি জীবন সংস্কৃতির যে ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া একান্তই অসম্ভব হলেও সামাজিক রাজনৈতিক প্রাত্যহিক জীবনচর্চার কিছুটা আভাস নিশ্চিত ভাবেই পাওয়া সম্ভব। সাহিত্যচর্চার মতো ভেবেচিন্তে কথা বসানো নয়, শব্দের চলন এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এমনকি কোনও ইতিহাস লেখার জন্য ভেবেচিন্তে কিছু করা হয়নি। তবু ছড়াগুলিতে রয়ে গিয়েছে নানা সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব, যার সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে সর্বকালেই ছড়া রচিত হয়ে থাকে। আমরা উদাহরণ হিসাবে প্রথমে খুব চেনা-জানা একটা ছড়া দেখি-

'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি।
ঢুলি গেল সেই কমলাফুলি।
কমলাফুলির টিয়েটা।
সুয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
এক খিলি পান কিনে খাই।
পানের ভিতর ফোঁপড়া।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল।
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদম তলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে।
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
'মামার নামে টগর ফুল'।'

-ছড়াটির প্রথম কয়টি ছত্রে বিবাহ যাত্রার বর্ণনা আছে। আগে অভিজাত পরিবারের বিবাহের শোভাযাত্রা ছিল যুদ্ধযাত্রারই পরিবর্তিত রূপ। কারণ একটা সময় জোর করে মেয়েদের তুলে আনা হত। বিজয়ী গোষ্ঠীর লোক বিজিত গোষ্ঠীর মেয়েদের বিয়ে করবে, এমন প্রথা ছিল। আজও কিছু অবাঙালিদের বিয়েতে ঘোড়ায় চেপে হাতে তরোয়াল নিয়ে বিবাহ করতে যাওয়ার রীতি আছে। এই ছড়াটিতে সেই বিবাহযাত্রারই একটি রূপের বর্ণনা পাই আমরা। কৃত্তিবাসী রামায়নেও এমন বীররসাত্মক বর্ণনায় বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার কথা বলা আছে। এমনকি তখনকার দিনে বিয়েতেও জয়ঢাক যে বাজানো হত, তার উল্লেখ আছে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। কিন্তু মূল ছড়ার প্রথম অংশ আসলে 'ডোম চতুরঙ্গের' বর্ণনা। এবার আসি সেই ইতিহাসের ভুলে যাওয়া গল্পে, যা প্রচ্ছন্নভাবে ধরা আছে এই ছড়ায়। সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের বাগদী রাজা, রূপারাজা যখন হরিবর্মার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন হুকুম দিলেন 'সব বাগদী সাজ'। রূপারাজার ছিল বাগদী ও ডোম সেনা। বাগদী সেনারা লড়াই করে, কিন্তু ডোম সেনারা রাস্তা তৈরি করে, শত্রুর উপর নজর রাখে। একসময় এই ডোম সেনারাই বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের, রাজনগরের সামন্তরাজাদের ডোম সেনা ছিল। 'আগডোম' মানে অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, 'বাগডোম' মানে বাগ বা পার্শ্বরক্ষী ডোমসেনা এবং 'ঘোড়াডোম' মানে অশ্বারোহী সৈন্যদল। যুদ্ধের দামামা বাজলেই এই ডোমসেনারা গিয়ে রাস্তা পর্যবেক্ষণ করতেন, রাস্তা বানাতেন আর ঘোড়ায় চেপে দেশের অবস্থা-পরিস্থিতির উপর নজর রাখা শুরু করতেন। এই ডোম জাতি রাঢ় অঞ্চলের সেই সমস্ত তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর শরিক, যারা একদিন নির্ভীক বীরের মতো যুদ্ধ করতেন সমাজের উঁচু তলার রাজা, মহারাজা ও সামন্তপ্রভুদের জন্য। তাঁদেরই বীরত্বের বলে প্রভুরা হতেন 'অরি-বিমর্দন', 'সসাগরা ধরণিপতি' আর থাকতেন নিরাপদে।

এই সব প্রভুদের বা রাজাদের কথা ইতিহাদের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেও, ডোমসেনাদের বীরগাথা ঠাঁই পায়নি কোন ইতিহাস বই বা তাম্রশাসনে। লেখা আছে তুর্কি আক্রমণে বীরমল্ল রাজাদের কথা। কিন্তু এই বাগদী ও ডোম সেনাদের বীরগাথা লুকিয়ে আছে বাংলার ছোট ছোট ছেলেদের খেলার ছড়ায়, আছে লোকসঙ্গীতে, লোকগাথা ও রাঢ় বাংলার মঙ্গলকাব্যে, যেগুলিকে অনেকেই ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। আজকের সাবাল্টার্ন স্টাডি দেখিয়ে দিয়েছে নিম্ন বর্গের ওপর উচ্চ বর্গের অত্যাচার এই ভাবে দেখতে হবে। এরাই হল সেকালের নিপীড়িত শ্রেণী। আশ্চর্য জনক ভাবে ইতিহাস নীরব এদের সম্পর্কে। এই ছেলে ভোলানো ছড়াতেই ধরা আছে সেই ডোমসেনাদের সীমান্তরক্ষার কাহিনি। মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক সাহিত্যে এইরকম অনেক ডোম বীরের শৌর্যের কাহিনী আছে। 'ধর্মমঙ্গল'-এ কালু ডোম ও

লখাই ডোম এর উদাহরণ আছে। তাই ছড়াটিকে আমরা ইতিহাসের স্বাক্ষর বলতেই পারি। তারপর একদিন এই ডোম সৈন্যদলের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ফুরোল, আর আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলেন এই সেনারা।

'এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং সই লো
একটি খবর আইলো
কিসের খবর আইলো
রাজা একটি বালিকা চাইলো
কোন্ বালিকা চাইলো
অমুক বালিকা চাইলো
কী প'রে যাবে?
বেনারসী প'রে যাবে।
কীসে ক'রে যাবে?
পালকি ক'রে যাবে।
কত টাকা দেবে?
হাজার টাকা দেবে।'

'এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং'-এর তাৎপর্য খুঁজে বের করা কঠিন কাজ। কিন্তু ছড়ার নাকি অংশের থেকে একটা বিশ্লেষণযোগ্য সমাজ ইতিহাসের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। 'রাজা' অর্থে সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা, যারা ইচ্ছামতো সাধারণ ঘরের বালিকাদের তুলে নিয়ে যাবার জন্যে পাইক পাঠাত বা নানা ব্যবস্থা করত। 'রাজা একটি বালিকা চাইলো' -এ কথা সেই সামাজিক চিত্রের আভাস দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই অর্থের বিনিময়ে মেয়ে কেনাবেচা চলত। রাজা বা জমিদাররা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ভোগের জন্য গরিব ঘরের মেয়েদের কিনতেন। দিল্লিতে এরকম মেয়ে কেনা-বেচার বাজার ছিল।

'উপেনটি বাইস্কোপ
উপেনটি বাইস্কোপ
নাইন টেন টাইস্কোপ
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
বাবু বলেছেন যেতে
পান সুপারি খেতে।
পানের ভিতর মৌরি বাটা
ইস্কাপনের ছবি আঁটা।
আমার নাম যদুমণি
যেতে হবে অনেকখানি।'

এই খেলাটি কয়েক প্রজন্ম আগে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে খেলেননি এমন কোনও মেয়ে পাওয়া বিরল। দু'জন রাজার উঁচুতে রাখা ইংরেজি হরফ 'ভি'-এর মতো হাতের ফাঁক দিয়ে সবাইকে বৃত্তাকারে ঘুরতে হয় আর ছড়াটি শেষ হতেই একজন ধরা পড়তেন তাদের হাতের ফাঁকে। আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনও মানে না বোঝা গেলেও ওই সাহেব বাবুর বৈঠকখানায় যদুমণির পান-সুপারি খেতে যাওয়ার নিমন্ত্রণের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক করুণ ইতিহাস। এই দেশে একটা সময় পর্তুগিজ ও ইংরেজ সাহেবদের মধ্যে এদেশীয় মেয়েদের রক্ষিতা বা বিবি হিসেবে রাখার একটা চল ছিল। আর তা যে তারা সোজা পথে করতেন, তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কখনও কখনও গ্রামবাসীরা ভয়ে নিজেদের বাড়ির মেয়ে তাদের সমর্পণ করতেন বা আবার কোথাও-কোথাও সাহেবরা বলপূর্বক এটি করতেন। আবার এই মেয়েদের তারা ক্রীতদাস হিসেবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 479 - 488
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিক্রিও করে দিতেন। ছড়াটিতে সাহেবদের বৈঠকখানার সেই আমোদ-প্রমোদের তাসের আসরে যদুমণিদের রক্ষিতা হয়ে যাওয়ার চিত্রই ফুটে উঠেছে। বাঙালি মেয়েদের এই লাঞ্ছনার ইতিহাসই লেখা আছে এই ছড়ায়। তবে 'বাইস্কোপ' কথাটির সংযোজন থেকে মনে হয় যে, এই কথাটি হয় পরবর্তী সংযোজন বা হীরালাল সেনের হাত ধরে এদেশে বায়োস্কোপ আসার পরবর্তীকালের সৃষ্টি।

ছোটদের খুব জনপ্রিয় গৃহ মধ্যস্থ একটি খেলা 'ইকিড়-মিকিড়'। এই খেলায় যে ছড়াটি উচ্চারিত হয় তা হল-

'ইকিড় মিকিড় চামচিকির
চামে কাটা মজুমদার।
ধেয়ে এল দামোদর।
দামোদরের হাঁড়ি কুঁড়ি
দুয়ারে বসে চাল কুড়ি।
চাল কুড়িতে হল বেলা
ভাত খেয়ে যা জামাইশালা।
ভাতে পড়ল মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা খ্যাঁকশিয়ালের মাথা।'

-নিতান্ত শিশুদের খেলার ছড়া। তবু এই ছড়াটিও ধরে রেখেছে ইতিহাসের একটি স্বল্প আলোচিত অধ্যায়। ছড়াটিতে ধরা আছে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠালেন বাংলার বারো ভুঁইঞাদের অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করতে। মানসিংহ জলঙ্গী নদী পেরিয়ে আসতে গিয়ে পড়লেন ঝড়ের কবলে। তখন তাকে সাহায্য করলেন তিনজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই পদবি ছিল 'মজুমদার'। তারা হলেন - নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এবং বাঁশবেড়ে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়ানন্দ মজুমদার। এঁরা তিনজনেই মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা, হুগলির কানুনগো দপ্তরের মুহুরি ভবানন্দ মজুমদারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। ভবানন্দ মানসিংহকে নৌকো দিয়ে নদী পার হতে সাহায্য করেন। নিজের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে আসেন ও বিশাল সৈন্যবাহিনীকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ফলে 'চামচিকির' কথাটার মানে যে বিশেষ সুবিধের নয় তা বোঝা সহজ। 'চামে কাটা' মানে যার 'চামড়া নেই' বা নির্লজ্জ–বেহায়া। আর ইঙ্গিতটি মানসিংহের সাহায্যকারী মজুমদারের প্রতি।

এই ছড়ায় ভয়ংকর দামোদরের সর্বনাশা সর্বগ্রাসী বন্যাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দামোদর নদের বন্যা তো একটা সময় প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাই কোনও নদীর বর্ষায় ফুঁসে ওঠা বা তার ভয়ঙ্কর রূপকে দামোদরের ধেয়ে আসার সাথেই তুলনা করা হত। আর তাই ঝড়বৃষ্টির রাতে ফুঁসে ওঠা জলঙ্গীকে এখানে দামোদরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানসিংহ ও তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার যে বিপুল আয়োজন তা ভবানন্দ মজুমদার হাসিমুখে করলেও তার তাঁর পাকশালের কাজের লোকেদের অবস্থার কথাও হয়তো ধরা আছে ছড়ায়। রান্নার ব্যবস্থা করতে তাদের বেলা গড়িয়ে যেত। আর বাংলার ভুঁইঞাকে আক্রমণ করতে আসা মানসিংহকে যে বাংলার মানুষ নেকনজরে দেখবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক। আর ভারত সম্রাটের সেনাপতিকে যে ভবানন্দ 'জামাই' আদরে রেখেছিলেন এটাও তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। যেহেতু ছড়াগুলির উৎপত্তিকালের কোনও লিখিত ইতিহাস নেই, তাই এই বিশ্লেষণগুলি নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। তবে প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ আর মানসিংহের এই সংঘাতের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

মধ্যযুগে বাংলা দেশে, বিশেষত রাঢ় বঙ্গে বর্গীর আক্রমণ ছিল নিত্য আতঙ্ক। নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে বর্গীর আক্রমণে বাংলার জনজীবন ভয়াবহ হয়ে পড়েছিল। বর্গীর অত্যাচারের ভয়ংকরতার কথা শুনে বয়স্ক মানুষের জিভ

শুকিয়ে যেত। আর শিশুদের কানে বর্গী শব্দটি পৌঁছলে তারা কান্না ভুলে মায়ের কোলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত। সেই ভয়ংকর হাঙ্গামার চিত্র তুলে ধরেছেন লোককবিরা-

‘ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরলো, পান ফুরলো, খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।’

-বর্গীর দল অত্যাচারের পাশাপাশি লুঠতরাজও করত। যথাসর্বস্ব লুঠ করে মানুষকে সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব করে দিত। তাই তারা জমিদারের খাজনা দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ছড়াকারগণ তাই ব্যঙ্গ করে ‘বুলবুলিতে ধান খেয়েছে’ বলে মন্তব্য করেছেন। মারাঠারাজ রঘুজি ভোঁসলের নেতৃত্বে ১৭৪১ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৭৫১-র মে মাস পর্যন্ত মরাঠা বর্গীদের দ্বারা ছ’বার বাংলা আক্রমণের ইতিহাস। মরাঠা বর্গীদের এই আক্রমণে বাংলা ও বিহারে প্রায় চার লক্ষ প্রান চলে গিয়েছিল এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তি লুঠ হয়েছিল। মহিলাদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে বর্গী দলের নেতা ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে আলিবর্দির সেনারা। বাংলার নবাবের সঙ্গে চৌথ আদায়ের চুক্তিতে সন্ধি হলে আক্রমণ বন্ধ হয়। ছড়ার মধ্যে খাজনা আদায় সংক্রান্ত উদ্বেগও স্পষ্ট। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অবধি এই আক্রমণ চলে। পূর্ববঙ্গে বর্গী আক্রমণ হয়নি। এই সময় বহু মানুষ কলকাতা ও বহু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ধরা পড়েছেন ছড়ায়-

‘কি হলোরে জান।
পলাশির ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীর মদন সাহেব কত নিচে সয়ে।
ছোটো ছোটো তেলিঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীর মদনের গায় ।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি ।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে তাঁর মাটি।
চান্দোয়া খাটাইয়া কান্দে মোহনলালের বেটি।’

পলাশির যুদ্ধে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, দেশপ্রেমিক মীরমদনের একক লড়াই এবং মৃত্যু সে সময়ে সাধারণ মানুষের মনে দাগ কেটেছিল, যার প্রকাশ ঘটেছে ছড়ায়। ইংরেজের আগমন সে সময় বাংলার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। বিশেষ করে মুসলমান সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই পূর্ববঙ্গের একটি ছড়ায়-

‘আইলরে ফিরিঙ্গির দল।
দেশটা গেল রসাতল।
সবার মুখে কোম্পানির দোয়াই।
আল্লাহ্ রসুল দেখো নাই।
ইংরেজ দেইখ্যা মাইয়ার দল।
চাইয়া হাসে খল খল।

মনে তাদের কি যে চায়।
কেউনা তাহা টের পায়।
বাবুয়ানা বিবিয়ানা।
ঘরে বাইরে এক টানা।
জাইত কুল সব গেছে।
আর কি দেশে মানুষ আছে।'

ইংরেজ সাহেবদের আগমন সে সময় বাঙালির সমাজ ব্যবস্থায় বড়োরকমের ধাক্কা দিয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ার একটা ভীতি প্রকাশ পেয়েছে ছড়ায়।

ইংরেজ শাসনে কিছু মানুষের হাতে অর্থের প্রাচুর্য ঘটে এবং সমাজে তাঁদের প্রভাব শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষ ভালো চোখে নেয়নি। আমিরচাঁদ ওরফে উমিচাঁদ ছিলেন একজন শিখ। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নানাবিধ মাল সরবরাহ করে ইনি প্রভূত অর্থশালী হন। এই ইতিহাস ছড়ায় উঠে এসেছে -

'নন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
হজুরীমলের কড়ি
বনমালী সরকারের বাড়ী।'

বলতে গেলে জগৎ শেঠ আর উমিচাঁদের মতো ধনী সে সময়ে আর কেউ ছিল না। হজুরীমল ছিলেন উমিচাঁদের শ্যালক। ভগ্নীপতির মৃত্যুর পর তিনি তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আর বনমালী সরকার 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানির আমলে পাটনার 'কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট' এবং পরে 'ডেপুটি ট্রেডার' পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রভূত ধনশালী হয়ে সে সময়ে চিৎপুর থেকে ভাগীরথীর ধার পর্যন্ত বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যদিও তার কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই।

'চাল ভাজা খাই খচর মচর, তিল ভাজা খাই গন্ধ।
রাজার বাড়ী বিয়ে হবে, হাজার টাকা দণ্ড।'

-ছড়াটি এমন এক যুগের রচনা, যখন জমিদাররা সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রায়শ স্থানীয়ভাবে রাজা বলে পরিচিত এবং বিয়ে, পুজো ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক-পারিবারিক উৎসব উপলক্ষ্যে মাগন বা খাজনা আদায় করা হত প্রজাদের কাছ থেকে। মূল খাজনার ওপরে যা কিছু জমিদারকে দিতে হত, তাই তখন প্রজাদের কাছে বিবেচিত হত সঙ্গত ভাবেই দণ্ড বা জরিমানা স্বরূপ।

লোকছড়ার চারিত্র্য থেকে বাংলা ছড়াকে প্রথম আধুনিক মাত্রায় অভিষিক্ত করেন ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়। দেশ-বিভাগের ডামাডোলের মধ্যে রাজনীতিবিদদের সংকীর্ণ স্বার্থচেতনা ও ভেদনীতিকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে অন্নদাশঙ্কর লিখলেন–

'তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো –
তার বেলা, তার বেলা?'

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এ ছড়ার পেছনে ক্রিয়াশীল আছে একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। যে ছড়া ছিল শুধুমাত্র গ্রামীণ লোকজ জীবন-ধারণের অন্যতম প্রকাশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে দেশবিভাগ সেই ছড়া সাহিত্যকে গ্রামীণ জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। ছড়ার ভাষা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের (বাংলা ১৩৮৫ সাল) বাংলায় বন্যা কত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। ভয়াল ভয়ংকর বন্যার পরের বছর দেখা দিল খরা। নিরন্ন মানুষের হাহাকার। চতুর্দিকে কোলাহল। গ্রাম ছেড়ে মানুষ কলকাতা শহরের পথে পা বাড়াল। সেই ভয়াবহতার চিত্র চিত্রিত হয়েছে ছড়ায় -

'আটাত্তরে গেল ঝরা,
ঊনআশিতে দারুণ খরা,
আশী সালে হে আমরা,
না খেয়ে আধমরা,
অনেক ছুটল্য কইলকাতা
লিয়ে তাঁদের ছেঁড়া কাঁথা।'

ইতিহাসের পাতায় '৭৮ সালের বন্যা এবং '৭৯ সালের খরার জ্বলন্ত চিত্ররূপ মুদ্রিত। সামাজিক ইতিহাসের দলিল রূপে ছড়াটি চিহ্নিত।

বঙ্গে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ অধিকারের মধ্য দিয়ে। হিজরী-সপ্তম শতকের পূর্বেই তিনি বঙ্গের রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। পরবর্তীকালে গিয়াসুদ্দিন ইয়ায, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ, রুকনুদ্দিন কায়কাউস প্রমুখ গৌড়কে রাজধানী করে বঙ্গ শাসন করেন। জনসাধারণের নিকট গৌড়ের মুসলিম শাসনকর্তা সম্ভবত গৌড়ের বাদশাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছড়ায় তারই পরিচয়-

'মারমু কোড়া
দিবো দৌড়-
বাশশার বাড়ী
পাচ্ গৌড়।'

-'পাচ গৌড়' এখানে পঞ্চ গৌড় এবং 'বাশশা' বা বাদশা শব্দ থেকে আগত প্রতীয়মান হয় যে তিনি একজন মুসলিম রাজা।

ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করে এই বিদ্রোহ ঠেকানো হয়। লোকছড়ায় সাঁওতালদের প্রতিরোধের একটি চিত্র -

'আমরা প্রজা, সাহেব রাজা,
দুঃখ দেবার যম।
তাদের ভয়ে হটবো মোরা
এমনি নরাধম?
মোরা শুধু ভুখবো?
না, না, মোরা রুখবো।'

ছড়ায় নীল বিদ্রোহের (১৯৫৯-৬০) চিত্রও পাওয়া যায়। অর্থকরী ফসল নীলচাষ এবং নীলকরদের অত্যাচার বাংলার কৃষি জীবনকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত। তাই কৃষকদের মুখে শোনা যেত -

১। 'ভাত মারলে নীল বাঁদরে
জাত মারলে পাদরী ধরে।'

২। 'জমীনের শত্রু নীল
কর্মের শত্রু ঢিল,
তেমনি জাতের শত্রু পাদরী হিল।'

ইতিহাসেও এই হিল-এর প্রসঙ্গ আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন –

> "এই সময়ে হরিশচন্দ্র অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দের পক্ষে হইয়া লেখনি ধারণ করিলেন। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়া আর্চিবল্ড হিলস নামক একজন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেট্রিয়টের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।"[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের আক্রমণের ভয়ে পূর্ববঙ্গীয়দের পালিয়ে যাবার বাস্তব ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে ছড়ায় -

'উইড়াছে জাপানী উড়ু জাহাজে।
বোমা ফেলে কাতার কাতার,
মানুষ গরু সব এক সঙ্গে হইল কাবার।।
সোনার দ্যাশ এই ভারত ভূমি,
নাইরে দুঃখ, নাইরে ব্যাধি,
তারা জোট পাকাইয়া বাধাইছে জঞ্জাল।'

এই ছড়ায় রাজনীতি এবং দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপ একটি ছড়ায় পাওয়া যায় -

'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোম ফেলেছে জাপানি।
বোমার মধ্যে কেউটে সাপ'
বৃটিশ বলে বাপরে বাপ।'

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু তার বিনিময়ে ভারতভূমি হল দ্বিখণ্ডিত- ভারত ও পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে এ বিভক্তির ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ও পাকিস্তানের সমপরিমাণ হিন্দু পরিণত হয় শরণার্থীতে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের মতো সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে পাড়ি জমালো নতুন আবাসভূমিতে। ইতিহাসবিদদের মতে দুইপক্ষে এরকম শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির অধিক। লোক ছড়ায় দেখি -

'কেত কুলিতে পাকিস্তান,
চল মোরা হিন্দুস্থান।
খাতা বালিশ গাটি বয়ে,
চল মোরা হিন্দুস্থান।'

বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজানুকূল্যে এবং ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এডওয়ার্ড এলবার্ট গেইট, বুচানান হ্যামিলটন প্রমুখ গবেষকের প্রদত্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম এই দেশীয় ধর্মান্তরিত মানুষ, বহিরাগত নয়। নৃতাত্ত্বিক পরিমাপেও হার্বার্ট হোপ রিসলে, ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে বঙ্গের মুসলমানদের শিরাকার ও নীসিকা সূচক সংখ্যা প্রাচীন বাঙালিদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্মান্তরের এই প্রক্রিয়ায় অনেক হিন্দু মহিলা যে মুসলমান পতি গ্রহণ করে তারও চিত্র লোকছড়ায় আছে -

'ডুলকির ভিতর থাকা ধান।
ছি, হিন্দুর সোয়ামি মোচরমান।'

ইতিহাসবিদও স্বীকার করেন যে বহিরাগত মুসলমানদের বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের হিন্দু রমণীদের বিয়ে করার অনেক নজির রয়েছে।

সামাজিক প্রথা আচার-আচরণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট শুধু নয়, বহু ব্যক্তি আছেন যারা ভালো বা মন্দ কাজের নিরিখে সমাজের বুকে স্থান করে নিয়েছেন। ভালো কাজের জন্য ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে বিরাজমান রয়েছেন, কেউবা কু-কর্মের জন্যে সমাজের বুকে নির্লজ্জ ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। যেমন -

'নিয়াজি রে নিয়াজি।
তোর খামু পিয়াজি।
তোরে দিমু শিক্ষা,
বুড়ি গঙ্গায় ফিক্কা।'

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের নিজামকে নিয়ে রচিত ছড়াটি। ছড়াটির মধ্যে শোষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। টিক্কা খান শোষণকারী হিসাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে -

'ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
বোয়াল মাছের দাড়ি।
টিক্কা খান ভিক্ষা করে
শেখ মুজিবের বাড়ি।'

-ছড়াটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণ। সেই সমস্ত পার্বণ উৎসব পালন থেকেই বাংলার নানা স্থানে গড়ে উঠেছে মন্দির মসজিদ ইত্যাদি। আর সেই সমস্ত ধর্মস্থানের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা। হয়তো বা কোনো ধর্মস্থানের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। আবার কোনো স্থানের তথ্য অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। বহু ছড়া প্রবাদ পুরাণের মধ্যে ইতিহাসের টুকরো রয়ে গেছে। সেরকমই একটি কোচবিহার জেলার ছড়া হল -

'বলরামপুরের বাঁশ।
কোচবিহারের রাস।'

-বলরামপুর তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত খুব বড়ো গ্রাম। সেখানকার বাঁশের বাস্তবিক প্রাচুর্য নেই; কোচবিহার শহরের বিখ্যাত রাস উৎসবই এ ছড়ার উদ্দিষ্ট। এ প্রসঙ্গে ড. শ্যামাচাঁদ মুখোপাধ্যায় বর্ণনা দিয়েছেন –

"মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক (১৮৮৯-৯০) বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটি নির্মিত। ... রাসপূর্ণিমার সময় প্রায় দশদিন ধরে সেখানে এক বিরাট উৎসব ও মেলা বসে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রবর্তিত এখানকার রাস উৎসব উত্তরবঙ্গের লোকোৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম বললে অত্যুক্তি হয় না।"[৩]

লালমাটির দেশ বীরভূম। শুধুমাত্র শান্তিনিকেতন নয়, বীরভূম জেলাবাসীদের গর্ব আরও কয়েকটি ধর্মীয়-ঐতিহাসিক পীঠস্থানকে ঘিরেও। সেইসব পীঠস্থানকে ঘিরে রচিত হয়েছে নানা ছড়া। তার মধ্যে একটি ছড়া হল -

'নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী,
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী।
তারাপীঠে মা জয়তারা
বোলপুরে কঙ্কালীতলা,
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা।'

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় বালিচক থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত কেদার গ্রাম। সেখানে রয়েছে কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির সম্পর্কে ছড়া শোনা যায় -

'যা নাই ভাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে)
তা কেদার কুণ্ডে।'

রাজা টোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগনার নাম দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে তার পূর্ব থেকেই এখানে এই শিবমন্দিরটি ছিল। রাজা যুগলকিশোর রায় নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্মাতা বলে কথিত।

আদতে ছড়া বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সমাজের অন্যতম দর্পণ, যা মৌখিক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে— রচনার সমকাল বা অতীতের অভিজ্ঞতা। সেই অতীত, বর্তমানের মতোই জীবন্ত এবং সত্য। লোকছড়ায় বৃহত্তর জীবন ও সমাজসত্য লুকিয়ে থাকে। আমাদের গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে এমন অজস্র ছড়া লুকিয়ে আছে। ইতিহাস শুধু রাজা-রানির কথা বলে, কিন্তু এই ছড়াগুলো বলে সাধারণ মানুষদের কথা। তাই এই ছড়াগুলি হারিয়ে গেলে এই ইতিহাস হারিয়ে যাবে। এগুলির সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শুধু ছড়া সংকলন নয়, তার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ছড়ার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করা দরকার। তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। অনুভব করতে পারবে কীভাবে আপাত শিশুতোষ ছাড়া তার দেহে ইতিহাস ও সমকালীন সমাজকে ধারণ করে, তার পরতে পরতে বুনে দেয় তৎকালীন স্বপ্ন ও মূল্যবোধ।

Reference:

১. রহমান, আতোয়ার, লোকসাহিত্যের কথা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২২

২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, এস.কে. লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ২০০

৩. মুখোপাধ্যায়, শ্যামচাঁদ, কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৭৪, পৃ. ৪০-৪১

Bibliography:

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৯৯

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (২য় খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (৩য় খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১০

আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য : ছড়া, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৫

শাসমল, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক উপাদান, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২২

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, ছড়ায় নৃতাত্ত্বিক উপাদান, বাংলার ছড়া : ছড়ার বাংলা, সম্পা. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮

রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২০

চৌধুরী, দুলাল, বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, ছড়ায় স্থান বিবরণ, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৬

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতি : নানাপ্রসঙ্গ, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৩৮৭